বৃদ্ধাশ্রম

উত্তরায়ণ দেব

[৭ই জুলাই, ২০০৮ উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ প্রকাশিত]

বৃদ্ধাশ্রম কি?

বন্ধ কালো কাঁচ ঢাকা বিলাস বহুল গাড়িটা আকাশচুম্বি বাড়িটার নীচ থেকে বেরিয়ে যেতেই, দারোয়ান লোহার ভারি গেটটা বন্ধ করে দেয়। মসৃন পাকা সড়কটা ছেড়ে অবশেষে গাড়িটা অন্য একটি পথে বাঁক নেয়। পেছনের আসনে চুপ করে বসে থাকা বৃদ্ধা বাইরের কালো দৃশ্যকে দেখবার বৃথা চেষ্টা করে এবং ঘাড় ঘুড়িয়ে তার পাশে ঘুমিয়ে পরা বাচ্চাটির মাথায় হাত বোলায়। হর্ন দিতেই কাঠের বড় গেটটা খুলে দেওয়া হলে, গাড়িটা সোজা ভেতরে চলে যায়। দরজা খুলে চালকের আসন থেকে সুবেশ লোকটি বেড়িয়ে এসে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দিতেই টুপ করে সাদা লোমশ কুকুরটা বেড়িয়ে এসেই পেছনের পা তুলে গাড়ির চাকা ভিজিয়ে দেয়, তারপর ছোট্ট ছেলেটি এবং সবশেষে নেমে আসেন সেই বৃদ্ধা। নীল পাড় সাদা শাড়ি পরা দুই মহিলা এগিয়ে গিয়ে একজন বৃদ্ধা ও অন্যজন পেছনের আসন থেকে ছোট ব্যাগটা তুলে নেয়। বাগান ঘেরা বাড়িটির জানালায়, বারান্দায়, বাগান থেকে আরও কিছু চোখমুখ নিষ্পলকে তাকিয়ে দেখল ঘটনাটা, যাদের মুখের বলিরেখাতেও অনেক অতীত লেখা। কিছু কাগজ পত্রে সই করে সুবেশ লোকটি বেরিয়ে আসে, বারান্দায় কাঠের লম্বা বেঞ্চের এককোনে বসে থাকা বৃদ্ধার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে, বৃদ্ধা হাত বাড়িয়ে মাথা ছোঁবার আগেই বাচ্চা ছেলেটিকে নিয়ে এগিয়ে যায়। কুকুরটির কুঁই কুঁই আওয়াজে পেছন ফিরে তাকায়, কুকুরটি বসে থাকা বৃদ্ধার পায়ের কাছে লেজ নাড়িয়ে নাড়িয়ে মাটি শুঁকে আওয়াজ করে চলেছে, দুর থেকে বাচ্চাটির ডাকেও সাড়া না দেওয়ায় এবারে বাচ্চাটি ছুটে এসে কুকুরটাকে তুলে নিয়ে চলে যায়। চশমার মোটা কাঁচের ওপাশে বৃদ্ধার বড় বড় চোখ দুটো অপলকে তাকিয়ে। জন্মের পর বাবার বাড়ি, তারপর স্বামীর বাড়ি, তারপর ছেলের বাড়ির ঠিকানা বদলে বদলে, বৃদ্ধা আজ পৌঁছল তার আরেক নতুন তথা শেষ ঠিকানায়, যার নাম বৃদ্ধাশ্রম।

বৃদ্ধাশ্রমের উৎপত্তি।

রাতের অন্ধকারে, সব কিছুর আড়ালে আবার কখনওবা দিনের আলোয় সকলের সামনে, নদীর পার ঝুপঝুপ করে ভেঙে পড়তেই থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মে নদী তার চলার পথে নতুন মোড় নেয়। ফলাফল, গোটা একটা এলাকা, ক্রমে একটি দেশ এবং তার অন্তীম পরিণতিতে একটি সভ্যতার বিলোপ ঘটে যায়, ইতিহাস বলে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক কারনে যৌথ তথা একান্নবর্তী পরিবারগুলো ধীরে ধীরে ভেঙে গিয়ে তৈরী হচ্ছে কামরা নির্ভর ফ্ল্যাট বাড়ি সংস্কৃতি। চোখের সামনেই ক্রমশ জন্ম নিচ্ছে নব্য এক আধুনিক সংস্কৃতি, ঘটে চলেছে এক বিরাট সামাজিক পট পরিবর্তন। আর এভাবেই চোখের সামনে অথচ দৃষ্টির অগোচরে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে এই সংস্কৃতির শেষ আশ্রয়। ঠিকানা, বৃ-দ্ধা-শ্র-ম।

বৃদ্ধাশ্রম এই শব্দটি বাংলা হলেও মুলত ইংরাজি OLDAGE HOME -এরই বাংলা অনুবাদ। মুল শব্দটির মত এই ধারনা বা বিষয়টিও পাশ্চাত্যের। অতীতে নিঃসন্তান বা অসহায় অর্থাৎ যাদের দেখাশুনার কেউ ছিল না, মুলত তাদের নিরাপত্তা বা আশ্রয়দানের প্রয়োজনের কথা ভেবেই বৃদ্ধাশ্রম স্থাপন করা হয়। ইতিহাস ঘেটে জানা যায় যে, অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কথা ভেবেই ১৯১১ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী, এ্যরিজোনার প্রেসকটে প্রথম বৃদ্ধাশ্রম স্থাপিত হয়।

ভারতবর্ষে বৃদ্ধাশ্রমের উৎপত্তি।

দেশ অর্থাৎ ভৌগলিক প্রভাব এবং কালের মিশ্রনে জন্ম নেয় কোন সংস্কৃতি। আর সেই সংস্কৃতিই তখন সেই পরিমন্ডলের জন জাতীর সমুদায় জীবন যাপন কে প্রভাবিত করে ও পরিচিত করায়। বর্তমানে বৃদ্ধাশ্রম বলতে যেই ছবিটি মানস চোখে ভেসে ওঠে তার বয়স কিন্তু এদেশে খুব বেশী নয়। কারন আমাদের সংস্কৃতিতে বৃদ্ধাশ্রমের অস্তীত্ব বা প্রকাশ ভঙ্গি ছিল স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মতো করে। মানুষকে বশে বা নিয়ন্ত্রণে রাখতেই ধর্মের উৎপত্তি। হিন্দু ধর্মে মৃত্যুর পরে স্বর্গলাভ বিষয়টি অত্যন্ত সৌভাগ্যের বা পরমপ্রাপ্তির। তাই এই ধর্মের অধীনস্ত মানবকূল কে আয়ত্তে রাখতেই ধর্ম বিধান দিল যে, সৎকাজ বা সৎজীবন যাপনই এই স্বর্গলাভের একমাত্র উপায়। সমগ্র জীবকূল সবেতেই সহজ পথ খোঁজে। ফলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মনে, স্বর্গলাভের অন্য একটি সহজ পথের ধারনা বা বিশ্বাসের জন্ম দিল যে, ভগবানের চরনে জীবন সঁপে দিলে বা মৃত্যুবরন করলে স্বর্গে তাঁর দর্শন বা আশ্রয় পাওয়া সহজ। অর এই সহজ সরল বিশ্বাস থেকেই তীর্থস্থানগুলোতে জীবনের শেষ বাকিদিনগুলো অতিবাহিত করবার একটা রীতি শুরু হল, ফল স্বরুপ তথাকথিত বৃন্দাবন, গয়া, কাশি, মথুরা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলিতে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাদের সংখ্যা বাড়তে শুরু করল। ভারতের তীর্থস্থানগুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আবাসগুলিকে, এই দেশের বৃদ্ধাশ্রমের প্রাক ধারনার সূত্রপাত বলা যেতে পারে।

কালের আবর্তনে বিদেশি সংস্কৃতির অনেক ধারাই আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এসে মিশেছে। সেই সব ধারা আমাদের কখনও করেছে উর্বর আবার কখনও আমাদের সংস্কৃতিকে করেছে বিপন্ন। ভারতবর্ষে বণিকের মানদন্ড যখন ধীরে ধীরে রাজদন্ডে রুপান্তরিত হল মোটামুটি সেই সময় থেকেই এই দেশে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচারের বাড়বাড়ন্তের শুরু। যেকোন জীবকে বশ করবার সব থেকে সহজ উপায় হল তাকে খাবার দেওয়া। এটা জীব তথা প্রাণীকূলের একটা স্বাভাবিক ধর্ম। চিরন্তন এই প্রাকৃতিক নিয়মটিকেই এই ধর্মের প্রচারকেরা কাজে লাগালেন। রাজনৈতীক কারনে অর্থের প্রাচুর্যতা বরাবরই একটু শহর কেন্দ্রীক। ফলে অবধারিত ভাবেই ক্ষুধার্থ ভারতবাসীকে খুঁজে বের করতে ও চিহ্নিত করতে সেই ধর্মপ্রচারকদের কোন অসুবিধেই হল না। মূল শহর থেকে একটু বাইরে তুলনামূলক অনুন্নত এলাকাগুলিতে ও গ্রামাঞ্চলে যেখানে আমাদের দেশীয় ধর্মের সেবা পৌঁছতে পারলনা, তারা অতি সত্বর সেই সমস্ত এলাকাগুলিতে একের পর এক চার্চের প্রতিষ্ঠা করে চলল। আর এই চার্চগুলিকে কেন্দ্র করে মানুষের সেবার পাশাপাশি চলল বিপুল পরিমানে ধর্মান্তরিত করন। আগে বেঁচে থাকলে তবেত ধর্ম পালন, সুতরাং আমায় যে খেতে দিয়ে বাঁচাল, আমার পরিবার-সন্তান সন্ততিকে যে রক্ষা করল আমি বা আমরা তার বা তাদের দলের। সহজ এই সত্যটি হয়ে গেল চিরন্তন সত্য।

ধর্ম প্রচারের মুল লক্ষ্যের পাশাপাশি, পরোক্ষ লক্ষ্যে মানব সেবার কারনে খ্রীষ্টিয় মিশনগুলি এদেশে চার্চকেন্দ্রীক অনাথ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করে চলল একের পর এক। যেই দেশে প্রায় ৭০% মানুষ অনুন্নত এলাকা বা গ্রামে বাস করে সেই দেশে বিনামুল্যে এহেন সেবা ও নিরাপত্তা লাভ করবার সদস্যের অভাব হল না। ফলে এই অনাথ আশ্রমগুলিতে সদস্য ক্রমাগত বেড়েই চলল। যার ফলে অচিরেই প্রয়োজন হয়ে পড়ল প্রবীণ সদস্যদের পৃথক ব্যবস্থা করবার। চার্চ কেন্দ্রীক মিশনের একই পরিধীর মধ্যে অনাথ আশ্রমগুলিতে গড়ে উঠল বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের থাকবার পৃথক ব্যবস্থা বা বাসস্থান। বৃদ্ধাশ্রম ব্যবস্থা বা ধারনাটি এই দেশে মুলত এইভাবেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে ও ছড়িয়ে পরে।

বর্তমান সমাজে বৃদ্ধাশ্রমের ভূমিকা।

অন্তসত্ত্বা এক মহিলা নিজের আসন্ন সন্তান সম্পর্কে আগাম ঘোষনা করেছিলেন যে তার পুত্র সন্তান হবে। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে তিনি কি করে এই আগাম ধরনা করলেন তার উত্তরে তিনি বলে ছিলেন, যে সন্তান জন্মের পূর্বাবস্থাতেই মায়ের গর্ভে পা ছোড়ে বা মায়ের পেটে লাথি চালায় সে সন্তান অবশ্যই পুত্র। ধারনাটিতে সামান্য কৌতুক মিশ্রিত থাকলেও নেতীবাচক মনোভাবাপন্ন অনেক মায়ের আবেগকেই উস্কে দেবে। কিন্তু কেন ? ছেলে বিদেশে থাকে, এইরকম একাকী জনৈক বৃদ্ধার নিজের ছেলের সম্পর্কে মন্তব্য – *ছেলেকেতো ১০ মাস ১০ দিন গর্ভে ধরেছিলাম, তাই ছেলে মাসে মাসে সেই গর্ভের বা গোডাউনের ভাড়া বাবদ টাকা পাঠিয়েই খালাস* – উক্ত জনৈক বৃদ্ধার যন্ত্রণার সুর হয়ত অনেক মায়ের কন্ঠেই আজ ধ্বনিত হয় বা হচ্ছেও। যে সন্তানকে মা গর্ভে আশ্রয় দিয়ে, নিরাপত্তা দিয়ে, নিজের খাবারের ভাগ দিয়ে, তীব্র যন্ত্রনা সহ্য করে পৃথিবীর আলো দেখায়, সেই সন্তান সেই মায়ের প্রয়োজনের দিনে বিপরীত আচরন করে বসে। কিন্তু কেন ? এর উত্তরের মধ্যেই নিহিত আছে আজকের সমাজে বৃদ্ধাশ্রমের ভূমিকা।

অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান – এই তিনটি মূল উপাদন মানুষের জীবন ধারনের জন্য প্রাথমিক শর্তে অপরিহার্য। এর পাশাপাশি রয়েছে আনুষঙ্গিক অন্যান্য উপাদান। কিন্তু পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার মূল বীজটি লুকিয়ে আছে প্রথম উপাদানটির মধ্যেই। মায়ের চোখের জলের ধারার উৎসও হয়ত সেই অন্নই। খুঁজে দেখা যাক।

প্রকৃতির সাথে যুঝতে ও লড়াই করতে পৃথিবীর আদিমকাল থেকেই মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ জীব। পরম্পরায় যার শেষ অস্তীত্ব আমরা দেখতে পাই যৌথ পরিবার প্রথায়। সময়ের প্রভাবে পরিবেশ পরিস্থীতি এই যৌথ পরিবারের ভিতকেও নাড়িয়ে দিল। বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় জানা গেছে যে বর্তমানে প্রবীণ ভারতবাসী (২০০৫ সালের জুলাই মাসের সর্ব শেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যা ১০৮,০২,৬৪,৩৮৮। আর এর মধ্যে ৬৫ বছরের ওপরে প্রবীণ পুরুষের সংখ্যা ২,৬৫,৪২,০২৫ এবং মহিলার সংখ্যা ২,৫৯,৩৯,৭৮৪) –র মাত্র ৬০% যৌথ পরিবারে বসবাস করে, আর বাকি ৪০% হয় স্বামী–স্ত্রী একসাথে আলাদা কোন বাসস্থানে থাকে নয়ত বাকি জীবন কাটাচ্ছে কোন বৃদ্ধাশ্রমে। আর এই হার এত দ্রুত বদলাচ্ছে যে এই রচনাটি তৈরী করা আর আপনার এই রচনাটি পাঠ করবার মধ্যে যদি সামান্য এক মাসেরও ব্যাবধান হয়, তাহলে উক্ত পরি সংখ্যানটির কিছু পরিবর্তন ঘটে যাবে। অথচ যৌথ পরিবারের সুবিধেগুলোকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। *জন্মঋন* – এই চিরন্তন আবেগটিকে সাময়িক পাশে সরিয়ে রাখলে দেখা যাবে যে, এই যৌথ পরিবারে প্রবীণ ও নবীণ নাগরিকেরা ঠিক যেন একে অপরের পরিপূরক। অভিজ্ঞতাই সব চেয়ে বড় শিক্ষক, আর তাই পরিবারের প্রবীণেরা অতীত জীবন যাপনের পার্থিব যাবতীয় সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দিয়ে একজন শিক্ষকের মত পরিবারের নবীণ সদস্যদের চালনা করতে ও উপদেশ দিতে পারেন। নিজের সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে বেঁচে থাকা মানে মাছকে জল থেকে আলাদা করে দেবার মতন। নিজস্ব সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে প্রবীণেরা নিজের সংস্কৃতি সম্পর্কে তার নতুন প্রজন্মকে সচেতন, অবহিত ও সুশিক্ষিত করে তুলতে পারেন। একটা জাতি এগিয়ে চলে এভাবেই। আবার উল্টোদিকে যৌথ পরিবারে প্রবীণ সদস্যরা কখনই একাকী বোধ করেন না। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাহচর্য তাঁদের শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সজীব থাকতে সাহায্য করে। শারীরিক অসুস্থতার চরম বিপদের মুহূর্তেও তিনি কখনই অসহায় বা একা নন।

যৌথ পরিবার ব্যবস্থার যাবতীয় সুবিধেগুলোকে মেনে নিয়েও এর ভাঙন রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্ন কেন্দ্রীক এর কারনগুলোও নানাবিধ। অর্থনীতির নিয়মে চাহিদার তুলনায় যোগানের অপ্রতুলতার

ফলাফলই মূলত এরজন্য দায়ী। পৃথিবীতে জনসংখ্যা বেড়ে যাবার কারনে এখানে জীবন ধারন ও জীবিকা নির্বাহ আজ এক কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি। সাংসারিক যাবতীয় চাহিদার নিবৃত্তিকরন এখন আর একার রোজগারে প্রায়শই সম্ভব হয়ে উঠছে না। ফলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বাইরে বেড়োতে বাধ্য হচ্ছে। মূলত অর্থনৈতীক পরিস্থীতির চাপে কখনও শহরের বাইরে অন্য কোন শহরে বা রাজ্যে এমন কি দেশের বাইরে বিদেশও পাকাপাকিভাবে সংসার স্থাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। খরচ সংকুলানের জন্য সব ক্ষেত্রে প্রবীণ সদস্যদের সঙ্গে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। কোনভাবে সেটা সম্ভব করে তুললেও বিপরীত দিকে আবেগ জনীত কারনে প্রবীণ সদস্যেরা নিজের ***ভিটেমাটি*** ছেড়ে অন্যত্র যেতে অনিচ্ছুক। যার পরিণতীতে ***হাঁড়ি*** আলাদা হচ্ছে। ফলে আগের মত সংসারের প্রবীণ সদস্যদের যথেষ্ট সঙ্গ দেওয়া বা তাদের যথাযথ দেখাশুনা করা বা যত্ন নেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না। এই ক্ষেত্রে প্রবীণ সদস্যরাও কোন রকম আপসে রাজি নন, কারন তাঁরা মনে করছেন যে পর্যাপ্ত আদর যত্ন পাবার তাঁদের অধিকার আছে। সেটা যথাযথ হয়ে উঠছে না বলে, তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই নিজেকে ভাবছেন অবহেলীত। অধিকাংশ প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে তৈরী হচ্ছে অন্য আরেকটি সমস্যা। তাঁরা তাঁদের সময়কার অর্থনৈতীক, সামাজীক, রাজনৈতীক পরিস্থীতির নিরিখে মিলিয়ে দেখছেন আজকের বদলে যাওয়া পরিস্থীতিকে। সময় দ্বারা প্রভাবিত ও চালিত তাঁর সন্তানের সাংসারিক ও কর্ম জীবন যাপনের রীতি নীতিকে মেনে নিতে বা তার সাথে খাপ খাওয়াতে পারছেন না, আর এই অক্ষমতাই বাড়িয়ে দিচ্ছে মানসিক অবসাদ আর ক্ষোভ। বর্তমান সময়ের প্রতিনীধি তাঁর নিজেরই সন্তানের সঙ্গে এরফলে তৈরী হচ্ছে এক ভ্রান্ত মান অভিমান। যার থেকে পরিবারে শুরু হচ্ছে মানসিক সমস্যা। আর তা থেকেই দুই ভিন্ন ছাদে আবার কখনওবা একই ছাদের নীচে বাড়ছে মনের দুরত্ব।

কোন গাঁথুনির উপকরনগুলোর মধ্যে দুরত্ব তৈরী হলে তা থেকেই সৃষ্টি হয় ফাটলের। আর এই দুরত্ব যখন আরও বেড়ে যায় ফাটলের ব্যাপ্তি যায় বেড়ে। আর বেড়ে যাওয়া ফাটলের সমষ্টিই এক সময় গাঁথুনিটিকে ধুলিস্মাৎ করে দেয়। পরিবেশ পরিস্থীতির চাপে যৌথ পরিবারগুলোর দুই প্রজন্মের বেড়ে যাওয়া মানসিক ব্যাবধানই, আখেরে চিরন্তন এই প্রথার ভেঙে পড়বার মূল কারন।

১৯৯৯ সালের পাওয়া জীবিকা নির্বাহের তথ্যের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ভারতবর্ষে ৬০% কৃষিজীবি, ১৭% শ্রমজীবি এবং ২৩% চাকুরিজীবি। প্রবীণ নাগরিকদের ভবিষ্যত নিরাপত্তার মাপকাঠি নির্দ্ধারনের জন্য এই পরিসংখ্যানটিকে জানা অত্যন্ত জরুরী। কারন যৌথ পরিবার ভেঙে গিয়ে তার থেকে বেড়িয়ে আসছে দুই ধরনের প্রবীণ নাগরিক। অতীত জীবনে চাকুরির সুবাদে পেনসন ভোগকারি স্বামী-স্ত্রী বা স্বামীর অবর্তমানে তাঁর পেনসন ভোগকারি বিধবা স্ত্রী (পূর্বের সামাজীক রীতিতে বয়সের ব্যাবধানের কারনে আমাদের দেশে মহিলা বিধবার সংখ্যা বেশী)। যারা কিনা আপাত দৃষ্টিতে অসহায় হলেও অর্থনৈতীক ভাবে স্বাবলম্বী। এরা এক ধরন, আবার অন্য ধরনের অবস্থা খুবই মর্মান্তিক অর্থাৎ বাকি ৭৭%। এরা সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ তাদের কন্যার বিয়ের যৌতুক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যায় বহন করে বা পুত্রের চাকরি বা ব্যাবসার পেছনে নিয়োগ করে আজ কপর্দকশূণ্য (এই অবস্থায় স্বামীহারা বিধবা স্ত্রীর অবস্থা হয়ে দাড়ায় খুবই শোচনীয়)। আর এই উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় সারা জীবনের সঞ্চিত বিন্দু বিন্দু উপার্জন দিয়ে তৈরী করা তাঁর নিজের স্বপ্নের বাড়িতেই তার অবস্থা অনেকটা, *নিজভূমে পরবাসী*। আর তখন এই পরবাসীরা চুড়ান্ত অপমান নির্যাতন সহ্য করে বাড়ির এককোনে পড়ে থাকছেন, কেউ হয়ে যাচ্ছেন নিখোঁজ, কেউ পথে পথেই ঘুড়ে চলেছেন যতক্ষন না ওপরের ডাক আসে, কেউ অন্যকোথাও শারীরিক শ্রম দিয়ে অন্যের দয়ায় সামান্য খেয়ে বেঁচে থাকছেন, আবার কেউ চরম অবসাদে নিজের জীবন .....। আর এইখানেই হাত বাড়াচ্ছে বৃদ্ধাশ্রম। বাকি জীবনটুকু অন্তত আত্মসম্মান নিয়ে আশ্রমের দয়ায় বা খরচের বিনিময়ে আশ্রমের পরিষেবায় বেঁচে থাকছে উভয় প্রকার প্রবীণ নাগরিক। সার্বিক আশ্রয় দানের নিরিখে এইখানেই বর্তমান সমাজে বৃদ্ধশ্রমের ভূমিকা।

বর্তমানে বৃদ্ধাশ্রমের প্রকারভেদ।

কালের চাকার আবর্তে জীবজগতে সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল। পাল্টে যায় প্রকৃতি, পাল্টে যায় পরিবেশ, পাল্টায় এর অধিনস্থ মানব সংস্কৃতি। সময়ের প্রভাবে ও চাহিদায় জন্ম নেয় নতুন বিষয়বস্তু। ফলে ব্যবস্থাপনা ও আদর্শগত দিক থেকে বর্তমানে দুই ধরনের বৃদ্ধাশ্রম আমরা দেখতে পাই। আদর্শের লক্ষ্যে অটুট থেকে আজও অসহায়, আশ্রয় ও সহায় সম্বলহীন বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের প্রতিকূল অবস্থা থেকে উদ্ধার করে বিনা খরচে আমৃত্যু ভরন পোষন, আশ্রয়, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা দেওয়া হয়। অর্থাৎ যেই আদর্শ নিয়ে বৃদ্ধাশ্রম শুরু হয়েছিল।

অর্থই নিরাপত্তা দেয়, এই ধারনাটিকে সত্য প্রমাণ করতে, বৃদ্ধাশ্রমের মূল ধারার পাশাপাশি অনেকেই নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে ভবিষ্যত জীবনে বৃদ্ধাশ্রমের পরিষেবা লাভ করতে চাইল। ফলে বৃদ্ধাশ্রমের মূল আদর্শ থেকে একটু সরে এসে, জন্ম নিল অন্য আরেক ধরনের বৃদ্ধাশ্রম যেখানে বৃদ্ধাশ্রমের সমুদায় পরিষেবা লাভের জন্য গাঁটের কড়ি খরচা করতে হয়। ইংরাজিতে একে *রিটায়ার্ড হোম* বলা হলেও মূলত তা বৃদ্ধাশ্রমেরই নামান্তর। বর্তমানে বিদেশের মত আমাদের দেশেও এই ধরনের বৃদ্ধাশ্রমের খুব প্রচলন বা চাহিদা। বরং বলা যায় সেবার ধারনাটি রুপান্তরিত হল ব্যাবসায়।

বৃদ্ধাশ্রমের ভবিষ্যত।

ভারতবর্ষের প্রবীণ নাগরিকদের দুঃখ কষ্টের পরিমান পাশ্চাত্যের তুলনায় অনেক বেশী। নিরক্ষরতাই এর জন্য অনেকটা দায়ী। ২০০৩ সালের সর্বশেষ পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে সমগ্র ভারতবাসীর এখনও ৪০% –র বেশী নিরক্ষর। আর তাই আমেরিকা, জার্মানি ও অষ্ট্রেলিয়ার মত দেশগুলোতে যেখানে প্রবীণ নাগরিকেরা সরকার থেকে নিজেদের সুযোগ সুবিধে আদায়ের জন্য পার্লামেন্টে নিজেদের মনোনিত প্রতিনিধিকে রাজনৈতিক দলের নিয়মেই পাঠাতে সক্ষম হয়, সেখানে আমাদের প্রবীণ নাগরিকেরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন না হয়ে সরকারের দয়ার মুখাপেক্ষী। বর্তমানে আমাদের দেশেও সরকার প্রবীণ নাগরিকদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধে দেওয়ার পাশাপাশি নতুন এক ভাবনা চিন্তায় ১৯৯৯ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারী তৎকালিন অর্থমন্ত্রী শ্রী যশোবন্ত সিংহ লোকসভায় ১৯৯৯–২০০০ সালের বাজেট পেশ কালে দেশের প্রবীণ নাগরিকদের জন্য *অন্নপূর্ণা* প্রকল্পের কথা ঘোষনা করেন। এতে বলা হয় যে রোজগারহীন প্রবীণ নাগরিকেরা যাদের দেখাশুনার কেউ নেই, যারা বয়স্ক পেনসনের আয়তায় থেকেও আপাতত তা থেকে বঞ্চিত তারা সরকারি তরফে বিনামূল্যে প্রতিমাসে ১০ কিলোগ্রাম খাদ্যশস্য পাবে। প্রায় ৬৫% নিরক্ষর ভারতবাসীর কত শতাংশ সরকারি এই প্রকল্প সম্পর্কে সচেতন, সন্দেহ আছে।

বিশ্বের প্রবীণ নাগরিকদের কথা ভেবে, ১৯৯১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ইউনাইটেড নেশনস্ জেনারেল এ্যসেম্বলী (রেজলিউশন নম্বর ৪৬/৯১) কিছু নীতির কথা ঘোষনা করে, তার মধ্যে একটিতে বলা হল – "***Older persons should be able to reside at home for as long as possible***"। ইউ, এন, ও–র উক্ত নীতিটি কিন্তু বেশ তাৎপর্য পূর্ণ। কারন ঘোষিত ওই ***possible*** শব্দটির মধ্যেই কোথায় যেন বৃদ্ধাশ্রমের বীজটি লুকিয়ে আছে। কারন যখন প্রবীণ সদস্যের পক্ষে বাড়িতে থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না, তখনই সুস্থ সাবলীলভাবে পাশ্চাত্যে বৃদ্ধাশ্রমের কথা ভাবা হচ্ছে। আমরা তাহলে সহজ ভাবে বিষয়টিকে ভাবতে পারছি না কেন ? তার একটাই কারন আমাদের জল, আমাদের মাটি, আমাদের বাতাস আমাদের সংস্কৃতিকে, আমাদের মনকে একটু অন্যভাবে গড়েছে। কিন্তু এবারে বোধহয় সময় এসেছে ক্রমে আমাদের ভাবনাগুলিকেও

যুগোপযোগী করে আধুনিক করে তোলবার। পরিবেশ পরিস্থীতি কিন্তু সর্বদাই সামাজীক পট পরিবর্তনের আগাম পূর্বাভাস জানিয়ে চলেছে। প্রাকৃতিক আগাম পূর্বাভাসকে যে মাঝি অবহেলা করে, সেই কিন্তু মাঝ সমুদ্রে বিপদে পড়ে। মানসিক দুরত্বের ফলে একই ছাদের নীচে যখন আর একসাথে থাকা সম্ভব হচ্ছে না, তখন সেখানে জোর করে থেকে পারস্পরিক মধুর সম্পর্কটাকে তীক্ত করে তোলবার পেছনে কোন আবেগময় যুক্তিই বিবেচ্য হতে পারে না। সুস্থ স্বাভাবীক সম্পর্কটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পৃথক অবস্থানই সেক্ষেত্রে সমিচিন। আলাদা থেকেও পারিবারিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে এবং যেকোন প্রয়োজনে আবার সকলে একত্রীত হওয়া যেতেই পারে। সুস্থ সজীবভাবে বেঁচে থাকার আনন্দ এতে একটুও কমে যায় কি ?

আজ এমনকি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা বৃদ্ধাশ্রমগুলিতেও প্রবীণ নাগরিকদের দেখাশুনার যতই নানাবিধ অয়োজন করা হোক না কেন একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে তা কখনই, নিজের বাড়ির পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু সকল সদস্যদের নিয়ে একটি সংসারের অটুট বন্ধনের পেছনে, কিছু অদৃশ্য উপাদান কাজ করে। তাহল ভালবাসা, মমতা, মায়া, স্নেহ ইত্যাদি। গায়ের জোরে কারও শরীরের বাইরে থেকে শেষ সুতোটুকুও হয়ত কেড়ে নেওয়া যায়। এমন কি পাশবিকভাবে শরীরের ভেতর থেকে বিভিন্ন অংশ কেটেও নিয়ে নেওয়া যায়। কিন্ত শত চেষ্টাতেও শরীরের ভেতরে ভালবাসা, মমতা, মায়া, স্নেহের সেই উপাদানগুলিকে খুঁজেও পাওয়া যাবে না। কারন সে সব আছে আমাদের অনুভবে। পৃথিবীতে সব কিছু চাওয়া যায় না, কিছু জিনিষ আছে যা পেতে হয়। এই চাওয়া পাওয়ার ব্যাবধান থেকেই কষ্টের শুরু।

পরিস্থীতিকে পাল্টাতে না পারলে পরিস্থীতির সাথে নিজেকে পাল্টে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। স্থান এবং কাল বদলালে আমরাও যেমন নিজেদের বদলে নিই, যেমন শীতকালে গায়ে গরম পোষাক পরি আবার বর্ষাপ্রধান এলাকায় যাবার সময় বর্ষাতি নিয়ে যাই, গরমের দেশে যাই সুতির হালকা পোষাক নিয়ে। কারন নইলে নিজেকেই কষ্ট পেতে হয়, ঠিক সেইভাবে পরিবর্তনশীল সামাজীক পরিস্থীতির সাথে নিজেকে পাল্টে না নিলে কষ্ট পেতে হবে আমাকেই। প্রখর দুরদৃষ্টিশীল রবী ঠাকুরের ইশারায়, সমগ্র পৃথিবীটাকে চামড়ায় মোড়া না গেলেও, আমি অন্তত নিজের পাটুকু চামড়ায় মুড়ে নিতেই পারি। সেখানেই আমার বিচক্ষণতা, সেখানেই আমার আরাম।

# # # # #

উত্তরায়ণ দেব

২৯/১২/২০০৫, কলকাতা